بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ এপ্রিল, ২০১৯ মোতাবেক ১৯ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো হযরত উসমান বিন মাযঊন। তার উপনাম ছিল আবু সায়েব। তার অর্থাৎ হযরত উসমানের মায়ের নাম ছিল সুখায়লা বিনতে আম্বাস। হযরত উসমান এবং তার ভাই হযরত কুদামা উভয়ের চেহারায় মিল ছিল। তিনি মক্কার কুরাইশদের বনু জামাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী (সা.) মক্কায় নিজ গৃহের প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে দেখে মুচকি হাসেন। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বসবে না? তিনি উত্তরে বলেন যে, কেন নয়। অতএব তিনি তাঁর (সা.) সামনে এসে বসে পড়েন। মহানবী (সা.) তার সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং এক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে তাকান। এরপর ধীরে ধীরে তিনি নিজের চোখ নীচের দিকে নামিয়ে আনেন এবং এক পর্যায়ে তিনি নিজের ডান দিকে মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, আর নিজের সাথে বসা উসমানের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে মনোযোগী হন এবং নিজের মাথা অবনত করেন। তিনি (সা.) তখন নিজের মাথা এমনভাবে নাড়ছিলেন যেন কোন কথা বুঝে নিচ্ছেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন পাশে বসে এই দৃশ্য দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) যখন সেই কাজ শেষ করেন, বা তিনি যে অবস্থাতেই ছিলেন, অথবা যে পরিস্থিতিই বিরাজমান ছিল তা যখন কেটে যায়; বাহ্যত মনে হয় যে, তাঁকে (সা.) কিছু বলা হচ্ছিল, হযরত উসমান তা জানতেন না, কিন্তু যাহোক মহানবী (সা.)-কে কিছু বলা হচ্ছিল, তিনি তা বুঝে নেন। এরপর তাঁর (সা.) দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে, যেমনটি প্রথমবার হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি কোন কিছুর অনুসরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সেই জিনিস আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) পূর্বের মতো উসমান বিন মাযঊনের প্রতি মনোযোগী হন। তিনি অর্থাৎ উসমান বলেন, আমি কোন্ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসব এবং বসব? হযরত উসমান বলেন, আজ আপনি যা করেছেন, এর পূর্বে আমি আপনাকে এমনটি করতে দেখি নি। তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে এই প্রশ্ন করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি আমাকে কী করতে দেখেছ? হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, আমি দেখলাম যে, আপনার দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে। এরপর আপনি ডান দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন। আপনি আমাকে ছেড়ে সেদিকে মনোযোগী হয়ে পড়েন। আপনি নিজের মাথা দুলানো আরম্ভ করেন, মনে হচ্ছিল যেন আপনাকে যা কিছু বলা হচ্ছে আপনি তা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তুমি এমনটি অনুভব করেছ? উসমান বিন মাযঊন বলেন, জ্বী। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এইমাত্র আমার কাছে আল্লাহ্ তা'লার দূত বার্তা নিয়ে এসেছিল যখন তুমি আমার কাছেই বসা ছিলে। হযরত উসমান বিন মাযঊন প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লার দূত? মহানবী (সা.) উত্তর দেন, হ্যাঁ।

হযরত উসমান জিজ্ঞেস করেন, দূত আপনাকে কী বলেছে? মহানবী (সা.) বলেন, দূত আমাকে বলেছে-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(সূরা আন্ নাহল: ৯১)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ আচরণের এবং পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন। আর অশ্লীলতা, মন্দকর্ম এবং বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। উসমান বিন মাযঊন বলেন, এটি ছিল সেই সময় যখন ঈমান আমার হৃদয়ে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে আর আমি মুহাম্মদ (সা.) কে ভালোবেসে ফেলি।

মহানবী (সা.) এর নবুয়তের ঘোষণার পর প্রাথমিক যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, (নবুয়তের ঘোষণার) কাছাকাছি যুগে অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) তালহা, যুবায়ের, উমর, হামযা, উসমান বিন মাযঊন- এর মতো এমন সাহাবীদের পেয়েছিলেন যাদের মাঝে প্রত্যেকেই তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর ঘামের জন্য নিজেদের রক্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৩ বছর পর্যন্ত বিপদাপদও এসেছে, সমস্যাও এসেছে, তাঁকে (সা.) কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি (সা.) নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই মক্কাবাসীদের মাঝ থেকে বুদ্ধিমান, বিবেকবান, মর্যাদাবান, তাকওয়াশীল, পবিত্র ব্যক্তিরা আমাকে গ্রহণ করেছে আর মুসলমানদের এখন একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ কথা বলতো যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি উন্মাদ, তখন তার সঙ্গী তাকে বলতো যে, যদি তিনি উন্মাদ হয়ে থাকেন তাহলে অমুক ব্যক্তি, কেন তাকে মান্য করে, যে খুবই বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান? এটি এমন এক উত্তর ছিল যার প্রতিউত্তর দেয়া কারো জন্য সম্ভব ছিল না।

ইউরোপিয়ান লেখকরা মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে নিজেদের পুরো লেখনীশক্তি ব্যয় করে, অনেক বিরোধিতাপূর্ণ কথা বলে, এমনকি অনেক সময় তাঁর (সা.) প্রতি নোংরা অপবাদ আরোপ করতেও দ্বিধা করে না। এখনও এসবই হয়। কিন্তু হযরত আবু বকরের নাম আসলে তারা বলে যে, আবু বকর খুবই নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে কতিপয় ইউরোপিয়ান লেখক লিখেন যে, আবু বকর যে ব্যক্তিকে মান্য করেছেন তিনি কীভাবে মিথ্যাবাদী হতে পারেন? যদি তোমরা আবু বকরের প্রশংসা কর তাহলে যে ব্যক্তিকে আবু বকর মান্য করেছে সে-ও নিশ্চয় প্রশংসাযোগ্য। যদি তিনি অর্থাৎ আবু বকর নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে এমন লোভীকে তিনি কেন মান্য করেছেন। আর যদি তিনি প্রকৃত অর্থেই নিঃস্বার্থ হয়ে থাকেন তাহলে মানতে হবে যে, তার মালিক বা প্রভুও নিঃস্বার্থ ছিলেন। এটি অনেক বড় একটি দলীল বা যুক্তি যা প্রত্যাখান করা সহয নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই যুক্তিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, মানুষ তাঁকে জাহেল বা অজ্ঞ বলে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই আপত্তিকে খণ্ডনের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) প্রাথমিক যুগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীও তাঁর (আ.) দাবির পূর্বে তাঁর প্রশংসাকারী ছিলেন। এরপর যখন তিনি পৃথিবীতে নিজের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ঘোষণা করেন তখন শিক্ষিত লোকদের এমন একটি জামা'ত আল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করান যারা তৎক্ষণাৎ তাঁর

প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এই শিক্ষিত লোকেরা আলেমদের মাঝ থেকেও ছিলেন, ধনীদের মাঝ থেকেও ছিলেন আর ইংরেজী জানা লোকদের মাঝ থেকেও ছিলেন। তিনি (রা.) এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, তিনটি জিনিসের মাধ্যমেই প্রভাব এবং প্রতাপের সৃষ্টি হয়। হয় ঈমানের মাধ্যমে, অথবা জ্ঞানের মাধ্যমে, কিংবা সম্পদের মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই তিনটি জিনিসই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁকেও প্রারম্ভেই এমনসব সঙ্গী বা অনুসারী দান করেছেন, জগদ্বাসী যাদের প্রশংসা করতো। বরং চিকিৎসা শাস্ত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর যশ ও খ্যাতি আজও স্বীকৃত। অ-আহমদী হাকীমরাও তাঁর ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে এবং এ সম্পর্কে কলম ধরে। যাহোক মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করার সূচনা এমন লোকদের মাধ্যমে হয় যারা সমাজের সকল স্তর থেকে ছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন।

অপর এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের আক্ষেপ এবং হিংসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, কাফেরদের হৃদয় সর্বদা পুড়ে ছাই হতো আর তারা কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে, এই হৃদয়-জ্বালা নেভানোর জন্য আমরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এমন কোন সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল না যার সদস্যরা মহানবী (সা.) এর দাসত্ব বরণ করে নি। হযরত যুবায়ের এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন, হযরত তালহা সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উমর এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উসমান সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন এক সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন আস এবং খালেদ বিন ওয়ালীদ, যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন, মক্কার শীর্ষস্থানীয় বংশের মানুষ ছিলেন। আস্ অর্থাৎ আমরের পিতা বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আমর মুসলমান হয়ে যান। ওয়ালীদ বিরোধী ছিল, কিন্তু খালেদ মুসলমান হয়ে যান। তিনি লিখেন যে, এককথায় হাজার হাজার লোক এমন ছিল যারা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিরা নিজেদেরকে মহানবী (সা.) এর চরণে সমর্পন করে আর রণক্ষেত্রে নিজেদের পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করে।

হযরত উসমান বিন মাযঊন এর ইথিওপিয়ায় হিজরত এবং সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উসমান বিন মাযঊন প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি ১৩ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তার পুত্র সায়েব মুসলমানদের একটি দলের সাথে ইথিওপিয়ার প্রথম হিজরতও করেছিলেন। ইথিওপিয়ায় অবস্থানকালে যখন তারা সংবাদ পান যে, কুরাইশরা ঈমান আনয়ন করেছে, তখন তিনি মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের কাছে যখন মহানবী (সা.) এর সাথে মক্কাবাসীদের সিজদা করার সংবাদ পৌঁছে তখন তারা সেখান থেকে যাত্রা করেন আর তাদের সাথে আরো লোকজন ছিল। পূর্বেও বা বিগত খুতবাগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। এই সিজদার কারণ কী ছিল? এ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, কাফেরদের সবাই মহানবী (সা.) এর আনুগত্য অবলম্বন করেছে। তারা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে আসল ঘটনা জানতে পারেন; তখন ইথিওপিয়ায় ফিরে যাওয়া তাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, তাদের কেউ কেউ সেখান থেকে ইথিওপিয়ায় ফিরেও গিয়েছিলেন এবং কারো নিরাপত্তার নিশ্চয়তাশূণ্য

অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করতে যারা ভয় পাচ্ছিলেন তারাও চলে গিয়েছিলেন। যাহোক তারা কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করেন, এমনকি তাদের প্রত্যেকেই মক্কাবাসীদের কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ যারা সেখানে এসে যায় তারা কারো না কারো কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুকালের জন্য পথিমধ্যেই অবস্থান করে। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান যখন দেখেন যে, মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা কষ্ট পাচ্ছেন, মানুষ তাদেরকে মারধর করছে, তাদের ওপর অত্যাচার করছে, আর তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয়ে আরামের সহিত জীবন যাপন করছেন। ওয়ালীদ মক্কার কাফের নেতাদের একজন অমুসলিম নেতা ছিল, তার কাছে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। উসমান বলেন, খোদার কসম, এক মুশরিকের আশ্রয়ে আমি নিরাপদে জীবন যাপন করছি অথচ আমার বন্ধু এবং পরিবারবর্গকে খোদার পথে দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। নিশ্চয় আমার মাঝে কোন ত্রুটি রয়েছে, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে এ কথা বলেন। অতএব তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র কাছে যান এবং বলেন যে, হে আবু আবদে শামস! (এটি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র উপাধি ছিল) তোমার দায়িত্ব শেষ। আমি তোমার আশ্রয়ে ছিলাম, এখন আমি এই আশ্রয় থেকে বেরিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে যেতে চাই, কেননা আমার জন্য মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। ওয়ালীদ বলে যে, হে আমার ভাতিজা! (ওয়ালীদ তার পিতার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল) সে বলে, হে আমার ভাতিজা! আমার নিরাপত্তার কারণে হয়ত তোমার কোন কষ্ট হয়েছে অথবা অসম্মান হয়েছে। তখন তিনি বলেন যে, না, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বা আশ্রয়েই সন্তুষ্ট। অর্থাৎ তোমার আশ্রয় থেকে বের হচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় বা নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট। আর আমি তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয়প্রার্থী নই। ওয়ালীদ বলে যে, কাবা শরীফের কাছে চল এবং সেখানেই ঘোষণার মাধ্যমে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দাও যেমনটি কিনা আমি তোমাকে ঘোষণা দিয়ে আশ্রয় প্রদান করেছিলাম। হযরত উসমান বলেন, চলুন। অতঃপর তারা উভয়ে কাবা শরীফের কাছে যান। ওয়ালীদ বলে (অর্থাৎ সে মানুষের সামনে এই ঘোষণা করে) যে, এ হলো উসমান, যে আমাকে আমার আশ্রয় বা নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে এসেছে। উসমান বলেন, সে সত্য বলছে। নিশ্চয় আমি তাকে (অর্থাৎ আশ্রয় প্রদানকারী ওয়ালীদকে) প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং নিরাপত্তা বা আশ্রয়ের দিক থেকে সম্মানিত পেয়েছি। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে আর কারো আশ্রয়ে বা নিরাপত্তায় থাকতে চাই না। তাই আমি ওয়ালীদ প্রদত্ত নিরাপত্তা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এরপর হযরত উসমান ফিরে যান।

ইথিওপিয়ায় এই হিজরতের উল্লেখ পূর্বেও বিভিন্ন সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় করা হয়েছে। পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্বৃতির বরাতে লিখেছেন। তিনি লিখেন, যখন মুসলমানদের কষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক, তার রাজত্বে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। হাবশা দেশটি, যা ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া হিসেবে অভিহিত, আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে দক্ষিণ আরবের মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে, আর মাঝে লোহিত সাগর ব্যাতিরেকে আর কোন দেশ নেই। সে যুগে ইথিওপিয়ায় এক শক্তিশালী খ্রিষ্টান

রাজত্ব ছিল। সেখানকার বাদশাহ্‌র উপাধী ছিল নাজ্জাশী, বরং এখন পর্যন্ত সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানকে এ নামেই ডাকা হয় (অর্থাৎ যখন তিনি এটি লিখেছিলেন তখনকার কথা হচ্ছে)। ইথিওপিয়ার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সেসময়কার নাজ্জাশী বা বাদশাহ্‌র নিজের নাম ছিল আসহামাহ্, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বিচারক, জাগ্রত-বিবেক এবং শক্তিশালী বাদশাহ্ ছিলেন। যাহোক, মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে (অর্থাৎ নবুয়তের দাবির পাঁচ বছর পর) ১১ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের মাঝে অধিক পরিচিত নামগুলো হলো- হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং তার সহধর্মিণী রসূল (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আল-আউয়াম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা (রা.), হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.), হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.) আর তার স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.)। তিনি (রা.) লিখেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো- প্রাথমিক এই হিজরতকারীদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের অন্তর্গত ছিলেন যারা কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রগুলোর সদস্য, আর দুর্বল কমই চোখে পড়ে। এ থেকে দু'টো কথা বোঝা যায়। প্রথমত শক্তিশালী গোত্রের অন্তর্ভুক্তরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বলরা, যেমন কৃতদাস শ্রেণির মানুষ, এতই দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, তাদের হিজরত করার সামর্থ্যও ছিল না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন; হযরত উসমান বিন মাযঊন এর মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ এবং এরপর লাবীদ বিন রাবিআ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেন, (এ কথা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি ওয়ালীদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন) মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মহানবী (সা.) একদিন তাঁর সাথিদের ডেকে পাঠান এবং বলেন পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপারে একটি ভূখণ্ড রয়েছে যেখানে খোদা তা'লার ইবাদতের অপরাধে মানুষের ওপর অত্যাচার করা হয় না। ধর্ম পরিত্যাগের কারণে মানুষকে হত্যা করা হয় না। সেখানে এক ন্যায়বিচারক বাদশাহ্ আছেন। তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যাও। হয়ত (এর ফলে) তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে। কতিপয় মুসলমান পুরুষ এবং নারী আর শিশু তাঁর (সা.) এই নির্দেশে আবিসিনিয়া চলে যায়। তাদের জন্য মক্কা থেকে বের হওয়া কোন সামান্য বিষয় ছিল না। এর সাথে আবেগের সম্পর্ক ছিল। নিজেদের দেশ ছেড়ে দেয়া সাধারণ কোন বিষয় ছিল না। মক্কার লোকেরা নিজেদেরকে কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করত। আর মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্য এক অসহনীয় ধাক্কা বা আঘাত ছিল। মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো-এ কথাটি কেবল সেই ব্যক্তিই বলতো পারতো যার এ পৃথিবীতে আর কোন ঠিকানা নেই। সুতরাং তাদের বের হওয়া খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। আর বেরও তাদের হতে হয়েছে গোপনে। কেননা তারা জানতেন যে, যদি মক্কাবাসীরা জানতে পারে তাহলে তারা আমাদের বের হতে দেবে না। এ কারণে তারা তাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনদের সাথে শেষ সাক্ষাৎ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সাথে দেখা করে যাওয়ার সুযোগও তারা পান নি, তারা গোপনে বেরিয়েছেন। তাদের হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল তা-তো ছিলই। তাদেরকে যারা দেখেছে তাদের জন্যও তাদের অবস্থায় ব্যথিত না হয়ে উপায় ছিল না। এভাবে হিজরতের কথা যারা জানতে

পারে, যারা ছিল অনাত্মীয়, তারাও তাদের এ অবস্থায় ব্যথিত ছিল। যেমন এ কাফেলা যখন বের হচ্ছিল তখন হযরত উমর, যিনি তখনও অবিশ্বাসী ছিলেন আর ইসলামের কঠিন শত্রু ছিলেন, মুসলমানদের যারা কষ্ট দিত তাদের মাঝে এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; দৈবক্রমে এ কাফেলার কতক ব্যক্তির সামনে পড়ে যান। তাদের মাঝে উম্মে আবদুল্লাহ্ নামের একজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন। হযরত উমর যখন বাধা জিনিসপত্র ও প্রস্তুত বাহনকে দেখেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এরা মক্কা ছেড়ে ছলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে উম্মে আবদুল্লাহ্! এ-তো হিজরতের প্রস্তুতি মনে হচ্ছে। উম্মে আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। খোদার কসম, আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাবো, কেননা তোমরা আমাদেরকে অনেক দুঃখ দিয়েছ আর আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছ। আমরা ততদিন স্বদেশে ফিরে আসবো না যতক্ষণ খোদা তা'লা আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা ও আরামের বিধান না করবেন। উম্মে আবদুল্লাহ্ বলেন, উমর উত্তরে বলেন, আচ্ছা, খোদা তোমাদের সাথী হোন। তিনি বলেন, আমি তার কণ্ঠে নিদারুণ ভাবাবেগ অনুভব করেছি, অথচ তিনি মুসলমানদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই হিজরত দেখে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি যে বলেছেন, খোদা তোমাদের সাথী হোন; সেই কণ্ঠে ছিল এক দয়া ও অনুকম্পা, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো অনুভব করিনি। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর দ্রুত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে চান। আমি অনুভব করলাম এ ঘটনায় তাঁর হৃদয় গভীরভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। যাহোক, মক্কাবাসীরা যখন তাদের হিজরতের কথা জানতে পারে, তখন তারা তাদের পিছু ধাওয়া করে আর সমুদ্র পর্যন্ত তাদের পেছনে পেছনে যায়। কিন্তু এই কাফেলা সমুদ্র উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তারা ইথিওপিয়ার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। মক্কাবাসীরা এটি অবগত হওয়ার পর ইথিওপিয়ার বাদশাহ্র কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যাদের কাজ হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করা এবং মুসলমানদের ফেরত পাঠাতে তাকে প্ররোচিত করা। যাহোক, এই প্রতিনিধি দল ইথিওপিয়ায় যায়, বাদশাহ্র সাথে মিলিত হয়। রাজদরবারীদেরও তারা মারাত্মকভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্র হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করেন। তিনি এদের নাছোড় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও, রাজদরবারীদের নাছোড় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানান। রাজদরবারীরাও মক্কাবাসীদের কথায় গলে যায় আর তারাও বাদশাহ্কে জোর দিয়ে বলে যে, এদেরকে মক্কাবাসী অর্থাৎ কাফেরদের হাতে সোপর্দ করুন। এই প্রতিনিধি দল যখন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে তখন মক্কাবাসীরা মুসলমানদের ফেরত আনার জন্য অপর একটি ফন্দি আঁটে আর তাহলো ইথিওপিয়াগামী কতক কাফেলার মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মক্কার সব মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। এই খবর যখন ইথিওপিয়া পৌঁছে তখন অধিকাংশ মুসলমান আনন্দের আতিশয্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে তারা জানতে পারে যে, এ খবর নিছক দুস্কৃতিমূলকভাবে ছড়ানো হয়েছে যাতে সত্যের লেশমাত্রও নেই। তখন কিছু লোক, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, ইথিওপিয়া ফিরে যায় আর কিছু মক্কায় অবস্থান করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মক্কায় অবস্থানকারীদের মাঝে হযরত উসমান বিন মাযঊনও ছিলেন, যিনি মক্কার অনেক বড় এক সম্পদশালী ব্যক্তির সন্তান ছিলেন। এবার তার পিতার এক বন্ধু ওয়ালীদ বিন মুগীরা তাকে আশ্রয় দেন। তিনি নিরাপদে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তখন তিনি দেখেন যে, অন্য কতক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে আর তাদের কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট দেয়া হয়। তিনি যেহেতু

আত্মাভিমানী যুবক ছিলেন, তাই ওয়ালীদের কাছে যান আর বলেন যে, আমি আপনার আশ্রয় ফেরত দিচ্ছি। কেননা আমার জন্য এটি অসহনীয় যে, অন্য মুসলমানরা কষ্ট সহ্য করবে আর আমি আরামে বা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব! সুতরাং ওয়লীদ ঘোষণা করে দেয় যে, উসমান এখন আর আমার আশ্রয়ে নেই। এরপর একদিন আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে বসে তার কবিতা শুনাচ্ছিল। সে একটি পঙ্‌ক্তি পড়ে যে,

وكل نعيم لا محالة زائل যার অর্থ হলো একদিন সকল নেয়ামত ফুরিয়ে যাবে, উসমান বিন মাযঊন বলেন, এটি ভুল কথা; জান্নাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী। লাবীদ অনেক বড় এক মানুষ ছিল। এ উত্তর শুনে সে ক্ষেপে যায় এবং বলে, হে লোকসকল! তোমাদের অতিথিকে পূর্বে এভাবে অপদস্থ করা হতো না। এই নতুন সংস্কৃতি কবে থেকে আরম্ভ হলো? তখন এক ব্যক্তি বলে যে, এ নির্বোধ মানুষ, তারা কথায় কর্ণপাত করবেন না। হযরত উসমান নিজের কথায় অবিচল থেকে বলেন, এতে বুদ্ধিহীনতার কী আছে? আমি যে কথা বলেছি তা সত্য। তখন এক ব্যক্তি গিয়ে সজোরো তাঁর মুখে ঘুসি মারে যার ফলে তাঁর একটি চোখ বের হয়ে আসে বা ফুলে যায়। তাঁর আশ্রয়দাতা ও পিতার বন্ধু ওয়ালীদ তখন সেই বৈঠকে বসা ছিল। উসমানের পিতার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তার প্রয়াত বন্ধুর পুত্রের এ অবস্থা তার কাছে অসহনীয় ছিল, কিন্তু মক্কার রীতি অনুসারে উসমান যেহেতু তার নিরাপত্তায় আশ্রিত ছিলেন না তাই সে তার পক্ষও নিতে পারছিল না। অতএব অন্য কিছু করতে না পেরে গভীর দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে উসমানকেই সে বললো যে, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! খোদার কসম, তোমার এই চোখ এই আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারতো, কেননা তুমি আমার বা একটি সুদৃঢ় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ছিলে, (অর্থাৎ ওয়ালীদের আশ্রয়ে ছিল) কিন্তু তুমি নিজেই তোমার আশ্রয়কে পরিত্যাগ করেছ আর আজকে এই দিন দেখতে হচ্ছে। হযরত উসমান উত্তরে বলেন, আমার সাথে যা কিছু হয়েছে আমি নিজেই এর বাসনা পোষণ করতাম। তুমি আমার বেরিয়ে আসা চোখের জন্য বিলাপ করছ, অথচ আমার সুস্থ চোখও ছটফট করছে যে, তার বোনের সাথে যা হয়েছে তা তার সাথে কেন হচ্ছে না? তিনি লিখেন, উসমান ওয়ালীদকে উত্তর দেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ আমার জন্য যথেষ্ট। যদি তিনি কষ্ট সহ্য করেন তাহলে আমি কেন করব না? আমার জন্য খোদার নিরাপত্তাই যথেষ্ট। উসমান বিন মাযঊন এবং আরবের প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ বিন রাবিআ'র ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে আরো একভাবেও পাওয়া যায়। আমি সেটিও শুনিয়ে দিচ্ছি, সে আরবের প্রসিদ্ধ কবি ছিল। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে কুরাইশদের বৈঠকে বসা ছিল। হযরত উসমানও তার কাছে বসে যান। লাবীদ প্রথমে পঙ্‌ক্তির এই ছত্র পড়ে যে,

আলা কুল্লু শায়ইন মা খালাআল্লাহ্ বাতেলো

অর্থাৎ সাবধান, আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছু বৃথা। তখন হযরত উসমান বলেন, তুমি সত্য বলেছ। পুনরায় লাবীদ বলে, **ওয়া কুল্লু নাঈমিন লা মাহালাতা যায়েল**। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সকল নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত উসমান বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। মানুষ তার দিকে তাকায় আর লাবীদকে বলে যে, পুনরায় পড়। লাবীদ পুনরায় পড়ে আর উসমান পূর্ববৎ একবার সত্যায়ন ও একবার খণ্ডন করেন, অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত বিলুপ্ত হবে না। লাবীদ বলে, হে কুরাইশগণ! তোমাদের বৈঠক তো এমন ছিল না। তাদের মাঝে এক আহাম্মক দাঁড়িয়ে হযরত উসমানের চোখের ওপর থাপ্পড় মেরে বসে বা ঘুসি মারে, যার ফলে তাঁর চোখ নীলাভ হয়ে যায়া বা ফুলে যায়। তার চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত মানুষ বলে যে, উসমান!

খোদার কসম, তুমি একটি নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলে আর তোমার চোখ এমন কষ্ট থেকে নিরাপদ ছিল যার এখন তুমি সম্মুখীন হয়েছ। তখন উসমান বলেন, খোদার আশ্রয় বেশি নিরাপদ এবং অধিক সম্মানজনক। আমার দ্বিতীয় চোখও সেই সমস্যাক্লিষ্ট হওয়ার বাসনা রাখে যাতে এই চোখ ক্লিষ্ট হয়েছে। মহানবী (সা.) এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অনুসরণ আমার জন্য আবশ্যক। ওয়ালীদ বলে, আমার আশ্রয়ে তোমার কী ক্ষতিটা হয়েছে? উত্তরে উসমান বলেন, খোদার নিরাপত্তা ছাড়া আমার অন্য কারো নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। এ ছিল সেসব লোকের ঈমানী অবস্থা, এ ছিল নিজের সাথিদের জন্য মর্মবেদনা, অর্থাৎ তারা যদি কষ্টে থাকেন তাহলে আমরা কেন সুখে থাকব? বরং মহানবী (সা.) এর সাথে যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তা-তো ছিলই অর্থাৎ তিনি যদি কষ্টে থাকেন তাহলে আমি কেন নিরাপদ থাকব? সাহাবাদের অবস্থা দেখেও তাঁর বড় কষ্ট হতো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের এভাবে উত্তর দেয়ার কারণ হলো, তিনি কুরআন করীম শুনে রেখেছিলেন, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং কুরআন করীম পড়েছিলেন। এখন তাঁর দৃষ্টিতে কবিতার কোন গুরুত্বই ছিল না। তিনি লেখেন, পরে লাবীদও মুসলমান হয়ে যায় আর মুসলমান হওয়ার পর লাবীদও এই পন্থাই অবলম্বন করেন। যেমন একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর একজন গভর্ণরকে বলে পাঠান যে, আমার কাছে কিছু প্রসিদ্ধ কবির নতুন কবিতা পাঠাও। লাবীদের কাছে, যিনি তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলে তিনি কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন।

হযরত উসমানের সাথে মহানবী (সা.) এর যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই একটি ঘটনার মাধ্যমে ঘটে; রওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ইন্তোকালের পর মহানবী (সা) তাকে চুমু খান আর তাঁর (সা.) এর চোখ থেকে তখন অশ্রু প্রবহমান ছিল। মহানবী (সা.) এর পুত্র ইব্রাহীমের যখন ইন্তেকাল হয় তখনও তিনি তার পবিত্র লাশের উদ্দেশ্যে বলেন, **আলহিক্ব বেসালাফিনাস্ সালেহ্ উসমান ইবনা মাযঊন**। অর্থাৎ আমাদের পুণ্যবান স্নেহভাজন উসমান বিন মাযঊন এর সাহচর্যে গিয়ে মিলিত হও।

হযরত উসমান বিন মাযঊনের মদিনায় হিজরতের ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ: উসমান বিন মাযঊন, হযরত কুদামা বিন মাযঊন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাযঊন ও হযরত সায়েব বিন উসমান মদিনায় হিজরতের সময় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানীর ঘরে অবস্থান করেন। অপর এক উক্তি অনুসারে এসব লোক হযরত হেযাম বিন ওদিয়ার ঘরে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী বর্ণনা করেন, মাযঊন পরিবার তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের নরনারী সকলেই সমবেতভাবে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের কেউ মক্কায় থেকে যায় নি। হযরত উম্মে আলা বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সা.) ও মুহাজিরগণ মদিনা আসেন তখন আনসারের বাসনা ছিল তাদেরকে নিজেদের ঘরে রাখার। তখন তাদের জন্য লটারি করা হয়। হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ভাগে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊন ও হযরত আবু হায়সাম বিন তায়হানের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত উসমান মদিনায় হিজরত করেন আর বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সবার চেয়ে অধিক আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে ইবাদত করতেন। দিনে রোজা রাখতেন, রাতে ইবাদত করতেন। কামনা বাসনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। নারীসঙ্গ বর্জনের চেষ্টা করতেন। তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে জগৎ ছেড়ে দেয়া ও খোজা হয়ে যাওয়ার অনুমতি

প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে এমনটি করতে বারণ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ ওসুদুল গাবায় এটি লিখিত আছে। এরপর এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, একদিন হযরত উসমান বিন মাযঊনের স্ত্রী মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে আসেন। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীরা তাকে আগোছালো অবস্থায় অর্থাৎ ময়লা কাপড় ও আগোছালো চুল দেখে বলেন, তুমি নিজের অবস্থা এমনটি কেন বানিয়ে রেখেছ? নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখো। কুরাইশদের কেউ তোমার স্বামীর চেয়ে বেশী সম্পদশালী নয়। এমন নয় যে, তোমার সামর্থ্য নেই। তোমার স্বামী খুবই ধনবান মানুষ, নিজের অবস্থা সুধরাও। তখন হযরত উসমানের স্ত্রী মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে, যাদের সবাই একসাথে বসেছিলেন, বলেন, আপনারা উসমানের যে ধনসম্পদের কথা বলছেন সেসবে আমাদের কোন অধিকার নেই; কেন? কেননা আমার জন্য তার মাঝে কোন আবেগ-অনুভূতি নেই। তিনি রাতে ইবাদত করেন আর আল্লাহর ইবাদতেই রত থাকেন, আমাদের প্রতি মনোযোগ দেন না। দিনে রোজা রাখেন। মহানবী (সা.) আসলে তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা তাঁকে ওসমানের স্ত্রীর কথা অবহিত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমার সত্তায় কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই? তিনি নিবেদন করেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, ব্যাপার কী? আমি শতভাগ আপনার কথা অনুসারে চলার চেষ্টা করি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সারাদিন রোজা রাখ আর সারারাত ইবাদত কর? তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ, আমি এমনই করি। তিনি (সা.) বলেন, এমনটি করো না। তোমার চোখের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার দেহের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার-পরিজনেরও তোমার কাছে প্রাপ্য রয়েছে, তোমার স্ত্রী-সন্তানের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নামায পড়, আবার ঘুমাও। নফল পড়, রাতে জাগ, কিন্তু ঘুমানোও আবশ্যক। রোজা রাখ আবার রোজা ছেড়েও দাও। যদি ঐচ্ছিক রোজা রাখতে হয় রাখ, কিন্তু কিছু দিন রোজা ছেড়ে দেয়াও আবশ্যক। হযরত উসমানকে মহানবী (সা.) এর একথা বলার স্বল্পকাল পর তাঁর স্ত্রী পুনরায় মহানবী (সা.) এর স্ত্রীদের কাছে আসেন। তিনি তখন এমনভাবে সুগন্ধি লাগিয়ে রেখেছিলেন যেন তিনি নববধূ। তাঁরা বলেন ব্যাপার কী, আজ খুব সেজেগুজে রয়েছে? তখন তিনি বলেন, আমরাও সেসব পেয়েছি যা মানুষের লব্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এখন স্বামী মনোযোগ দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊনকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি কি আমার রীতি অপছন্দ কর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না, আমি আপনার পন্থাই অন্বেষণ করি। তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমাইও, আবার নামাযও পড়ি। রোজাও রাখি আবার রোজা ছেড়েও দেই। মহিলাদের বিয়েও করি। হে উসমান! খোদাকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার অতিথির অধিকার রয়েছে, আর স্বয়ং তোমার নিজ প্রাণেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন কোন সময় রোজা রেখো আর কোন সময় ছেড়ে দিও। নামাযও পড় আবার বিশ্রামও কর।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন মহানবী (সা.) এর কাছে স্ত্রীদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন; কিন্তু তিনি (সা.) এর অনুমতি দেন নি। যদি তিনি অনুমতি দিতেন তাহলে আমরাও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের খোজা

বানিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অর্থাৎ এই আকর্ষণকে বিলুপ্ত করার জন্য পুরো চেষ্টা করতাম।

বুখারীর যে হাদীসটি রয়েছে সেটির অনুবাদ তুলে ধরছি। হযরত সাদ বিন ওক্কাস বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন বৈরাগ্য বা জগতবিমুখতার যে অনুমতি মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রার্থনা করেছেন, মহানবী সেই অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এটি বুখারীর নিকাহ্ অধ্যায়ের হাদীস। তাতে এটিও লেখা আছে যে, তিনি (সা.) যদি অনুমতি দিতেন তাহলে হয়ত আমরা সকলেই সম্পূর্ণভাবে বৈরাগী বা সংসারত্যাগী হয়ে যেতাম।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরো লিখেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন বনী জুমাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখতেন। অত্যন্ত সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি অজ্ঞতার যুগেই মদ্যপান করা থেকে দূরে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কখনো মদ পান করতেন না। ইসলাম গ্রহণের পরও সংসারত্যাগী হওয়ার বাসনা রাখতেন। কিন্তু মহানবী (সা.) এই বলে তাকে অনুমতি দেন নি যে, ইসলামে কৌমার্যের অনুমতি নেই। ইসলাম বলে পৃথিবীতে থাক। আল্লাহ তা'লা পৃথিবীতে যেসব নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন সেগুলো উপভোগ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলবে না। তিনি যেন সবসময় দৃষ্টিপটে থাকেন। হযরত কুদামা বিন মাযঊন কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর বিন খাত্তাব হযরত উসমান বিন মাযঊনের সাথে মিলিত হন। তিনি তার বাহনের ওপর ছিলেন আর উসমান তাঁর বাহনের ওপর। আসায়া নামক উপত্যকায় তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। আসায়া যুল হুলায়ফার পর জোহফার রাস্তায় মদিনা থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি এই জায়গার ভৌগলিক অবস্থান। হযরত উমরের উষ্ট্রী হযরত উসমানের উষ্ট্রীকে বেশি কাছে এসে যাওয়ার কারণে ধাক্কা দেয় বা চাপ দেয়। মহানবী (সা.) এর বাহন কাফেলার বেশ অগ্রভাগে ছিল। হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, ইয়া গালকাল ফিতনা! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বাহন যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব কাছে আসেন আর বলেন, হে আবু সায়েব! (অর্থাৎ হযরত উসমান বিন মাযঊনকে বলেন) খোদা তোমায় ক্ষমা করুন। তুমি আমাকে এটি কোন নামে ডাকলে? তিনি গালকাল ফিতনা বলে ডেকেছিলেন। তিনি বলেন, খোদার কসম, যে নামে আমি আপনাকে ডেকেছি সেই নাম আমি রাখিনি বরং মহানবী (সা.) আপনার সেই নাম রেখেছেন। হযরত উসমান বিন মাযঊন বলেন, মহানবী (সা.) কাফেলার অগ্রভাগে রয়েছেন, আপনি যদি চান তাঁকে জিজ্ঞেসও করতে পারেন। এর বিস্তারিত বিবরণ তিনি এভাবে প্রদান করেন যে, একবার তিনি অর্থাৎ হযরত উমর আমাদের পাশ দিয়ে যান আর আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে বসেছিলাম। মহানবী (সা.) বলেন, এ ব্যক্তি গালকুল ফিতনা অর্থাৎ নৈরাজ্যের পথে বাধা। এ কথা বলতে গিয়ে তিনি (সা.) তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন যে, তোমাদের ও নৈরাজ্যের মাঝে একটি দ্বার থাকবে যা কঠিনভাবে অবদ্ধ থাকবে যতদিন এ ব্যক্তি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকবেন, অর্থাৎ হযরত উমর যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ইসলামে কোন নৈরাজ্য দেখা দেবে না আর ইতিহাসও তা-ই বলে। এর পরই বেশির ভাগ নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছে। এখানে হযরত উসমান বিন মাযঊন হযরত উমর বিন খাত্তাব সম্পর্কে যে গালকুল ফিতনা শব্দ ব্যবহার করেছেন এর বিশদ বিবরণ দিচ্ছি। হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেন, আমরা উমর (রা.) এর কাছে বসে ছিলাম। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে কে নৈরাজ্য সম্পর্কে মাহনবী (সা.) এর কথা মনে রেখেছে? আমি বললাম, আমি, ঠিক সেভাবে যেভাবে তিনি (সা.) বলেছেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে। হযরত উমর বলেন, তুমি মহানবী

(সা.) সম্পর্কে বা হয়ত বলেছেন রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেক সাহস রাখ। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস অনেক বেশি মনে হচ্ছে, বড় বীরত্ব প্রদর্শন করছ। আমি বললাম, মানুষের ওপর তার স্ত্রী, সম্পদ ও সন্তানসন্ততি এবং প্রতিবেশীর কারণে পরীক্ষা আসে; এগুলোও নৈরাজ্য। আর নামায, রোযা, সদকা ও পুণ্যের আদেশ দেয়া, পাপ থেকে বিরত রাখা এই পরীক্ষাকে দূর করে। হযরত উমর বলেন, আমার কথার অর্থ সন্তানসন্ততি, সম্পদ ইত্যাদির ফিতনা নয়, যা তুমি নামায পড়ে, রোযা রেখে, নেক কাজ করে, সদকা দিয়ে দূরীভূত করতে পার, বরং আমি সেই নৈরাজ্যের কথা বলছি যা সেভাবে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হবে যেভাবে সমুদ্র হয়ে থাকে। অর্থাৎ বড় ভয়াবহ ফিতনা এই উম্মতে দেখা দিবে। হযরত হুযায়ফা বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সেটির জন্য আপনার কোন ভয় নেই। অর্থাৎ সেই যে নৈরাজ্য দেখা দেবে, এর পক্ষ থেকে আপনার কোন আশঙ্কা নেই। আপনার আয়ুষ্কালে এটি দেখা দেয়ার কোন আশঙ্কা নেই, কেননা আপনার ও এর মাঝে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, এটি কি ভাঙা হবে নাকি খোলা হবে? তিনি (অর্থাৎ হুযায়ফা) সে কথাই বলেন, যা মহানবী (সা.) বলেছেন যে, এক আবদ্ধ দরজা থাকবে। অর্থাৎ নৈরাজ্য ও তার মাঝে একটি আবদ্ধ দ্বার বিদ্যমান থাকবে। হযরত উমর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সেই দরজা কি ভেঙে ফেলা হবে, নাকি খুলে দেয়া হবে? তিনি বলেন, সেই দরজা ভেঙে ফেলা হবে। হযরত উমর বলেন, তাহলে তা কখনো বন্ধ হবে না। যদি দরজা খোলা হয় তাহলে বন্ধ করার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যদি ভেঙে ফেলা হয় তাহলে তা বন্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। তখন হযরত উমর বলেন, তাহলে তো তা কখনো বন্ধ হবে না। অর্থাৎ নৈরাজ্য একবার আরম্ভ হলে তা চলমান থাকবে। আজ আমরা দেখি যে, এসকল নৈরাজ্য মুসলমান উম্মতে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একের পর এক নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিতে থাকে। হযরত উসমান ও হযরত আলীর যুগে এবং পরবর্তী বিভিন্ন যুগেও, বরং এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে একই ধারা অব্যাহত আছে। তারা একে অন্যের রক্তপিপাসু শত্রু। আর সেই দেয়ালের পেছনে এরা আশ্রয় নিতে চায় না যা আল্লাহ তা'লা এ যুগে সেই দ্বার বন্ধ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নৈরাজ্য বেড়ে চলেছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকেও নিরাপদ রাখুন যেন আমরা আহমদীরা সেই ঢালের পেছনে থাকি যা আল্লাহ তা'লা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ এর মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন; এবং সেই দেয়ালের পেছনে থাকি। যাহোক এসব কথা হচ্ছিল। হযরত উমর বলেন, তাহলে তো এই নৈরাজ্য কখনো বন্ধ হবে না। তখন আমরা, অর্থাৎ যারা বসেছিল, রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা হযরত হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করি, হযরত উমর সেই দরজাকে জানতেন কি? হযরত হুযায়ফা বলেন, হ্যাঁ জানতেন। তিনি ঠিক সেভাবে জানতেন যেভাবে পরবর্তী দিন আসার পূর্বে রাত হয়ে তাকে। অর্থাৎ এটি শতভাগ নিশ্চিত কথা। হযরত উমর জানতেন যে, তারপর নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেবে।

হযরত উসমান বিন মাযঊন প্রথম মুহাজের ছিলেন যিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনায় দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের ২২ মাস পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর যাদের জান্নাতুল বাকী-তে দাফন করা হয়েছে তাদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। যাহোক তার বরাতে আরো কিছু কথাও আছে যা ইনাশাল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করবো।